SUṢAMĀ : Multidisciplinary Research Journal ISSN: 3107-4529
(International Peer-Reviewed & Refereed Journal)
Vol. 1, Issue-4, (Oct-Dec) 2025

রাষ্ট্রনীতি বা দণ্ডনীতির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

Dr. Sonali Mukherjee
Assistant Professor, Dept. of Sanskrit
Seva Bharati Mahavidyalaya, Jhargram, West Bengal, India
Email: sonali.sans.19@gmail.com

Abstract: সংস্কৃতসাহিত্য ভারতীয় সংস্কৃতির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। মানব-মনীষার উচ্চস্তরের প্রায় সমস্ত চিন্তাভাবনাগুলিই সংস্কৃতভাষায় বিধৃত হয়েছে। প্রাচীনকাল থেকে বিশালায়তন এই সংস্কৃতশাস্ত্রে কিভাবে রাষ্ট্রনীতিমূলক আলোচনার পরিপুষ্টি ঘটেছে সেই বিষয়ে আলোকপাত করা প্রয়োজন। অন্যান্য শাস্ত্রের ন্যায় সংস্কৃত রাষ্ট্রনীতির প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় বেদে। তৎকালীন রাষ্ট্রনীতি এবং বর্তমানে রাষ্ট্রনীতি এক নয়। সেযুগে রাজার উৎপত্তি এবং তার অনুসৃত নীতি, রাজ্যকে বশীভূত রাখার বিবিধ পন্থা ছিল রাষ্ট্রনীতির মূল মন্ত্র। অনুরক্ত। রাজার অবলম্বন করা যে সব নীতিগুলি প্রজাদের রাজানুরক্তির কারণ সেই সব নীতির প্রণয়ন ও বিশ্লেষণই দন্ডনীতির প্রতিপাদ্য বিষয়। রাজা রাষ্ট্র প্রভৃতির স্পষ্ট ধারণা ঋগ্বেদে ছিল। রাজপদ নির্বাচনসাপেক্ষ এবং বংশানুক্রমিক – এই উভয়মতই বেদে লভ্য। অথর্ববেদে যেমন রাজার নির্বাচনের কথা আছে। তারও পরবর্তী ধর্মশাস্ত্রের যুগে রাজপদকে দেবদৃষ্ট বলে ঘোষণা করে তাকে বংশানুক্রমিক রূপে প্রদর্শন করা হয়েছে। বৈদিক যুগের পরে রামায়ণ ও মহাভারতের যুগে রাষ্ট্রনীতি তথা দণ্ডনীতিচিন্তা আরো বিস্তৃতি লাভ করে। রামচন্দ্রের চিত্রকূটে অবস্থানকালে ভরত যখন তাকে ফিরিয়ে আনতে যান, তখন রামচন্দ্র তাকে যে উপদেশ দেন তা রাষ্ট্রনীতিমূলক তাৎপর্যে পরিপূর্ণ। মহাভারতের ভান্ডারে সবকিছুই রক্ষিত। এখানে অন্যান্য সমস্ত ধর্মের মধ্যে রাজধর্মকে বা দণ্ডনীতিকে শ্রেষ্ঠধর্ম বলা হয়েছে। রাষ্ট্রনীতিমূলক তত্ত্ব পরিপুষ্টি লাভ করেছে মহাভারতের সভাপর্বে যুধিষ্ঠিরের প্রতি নারদের রাজধর্মের উপদেশ, আশ্রমবাসিক পর্বের পঞ্চম অধ্যায়ে ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের রাজনৈতিক আলোচনায়। মহাভারতের রাজধর্মপর্বের ৫৯ তম অধ্যায়ে 'পৈতামহ তন্ত্র' নামক ভারতীয় দণ্ডনীতির উপর রচিত প্রাচীন গ্রন্থটির উল্লেখ পাওয়া যায়। সংস্কৃত স্মৃতিশাস্ত্রগুলির মধ্যে রাষ্ট্রনীতি বিষয়ক সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হল কৌটিল্যপ্রণীত অর্থশাস্ত্র। অর্থশাস্ত্র কিন্তু অর্থনীতি বিষয়ক শাস্ত্র নয়। কৌটিল্যের রাষ্ট্রনীতি বর্ণাশ্রম ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। কৌটিল্যের রাজনীতিতে স্বেচ্ছাচারিতার কোনো অবকাশ ছিল না। দেওয়ানী এবং ফৌজদারী মামলার সর্বাধ্যক্ষ হিসেবে রাজাই গণ্য হতেন। বিচারের ক্ষেত্রে অপরাধীকে শাস্তিস্বরূপ দণ্ড দেওয়ার রীতি ছিল। শুক্রাচার্য রাষ্ট্রনীতি চিন্তাকে সুসংহত রূপে শুক্রনীতিসার গ্রন্থ রচনা করেন। প্রজাদের বশীভূত করার উপায়, উপায়চতুষ্টয়, ষাড়গুণ্য প্রভৃতি রাজনীতিমূলক বিষয়ের আলোচনা রয়েছে। প্রাচীন ভারতের রাজনীতি বা দণ্ডনীতি হল আধুনিক যুগের রাষ্ট্রনীতি বা রাষ্ট্রবিজ্ঞান। ভারতীয় রাজনীতির আলোচনা প্রসঙ্গে স্মৃতিশাস্ত্রগুলি বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। মনুসংহিতার সপ্তম অধ্যায়ের বিষয়বস্তু রাজধর্ম। যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার ব্যবহার অধ্যায় রাজনৈতিক আলোচনায় সমৃদ্ধ। এই আলোচনার ধারা বৈদিক এবং স্মৃতি শাস্ত্রের অধ্যায় পেরিয়ে লৌকিক সংস্কৃতসাহিত্যের আলোচনায় মহাকাব্যগুলিতে বিক্ষিপ্তভাবে প্রবহমান।

Keywords: রাষ্ট্রনীতি, বৈদিকযুগ, দণ্ড, রাজধর্ম, স্মৃতিশাস্ত্র, কৌটিল্য।

ভূমিকা: সংস্কৃতসাহিত্য ভারতীয় সংস্কৃতির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। সংস্কৃতসাহিত্যকে ভারতীয় সংস্কৃতির বাঙ্ময় প্রকাশ বললে অত্যুক্তি করা হয় না। মানব - মনীষার উচ্চস্তরের প্রায় সমস্ত চিন্তাভাবনাগুলিই সংস্কৃতভাষায় বিধৃত হয়েছে। এই সংস্কৃত সাহিত্যে বেদোপনিষদ - ব্রাহ্মণ – আরণ্যক - রামায়ণ - মহাভারত - পুরাণ- অর্থশাস্ত্র - মনুসংহিতা -

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা - কামন্দকীয় নীতিসার - শুক্রনীতিসার থেকে শুরু করে কালিদাস - ভারবি - ভট্টি - কুমারদাস - মাঘ - শ্রীহর্ষ প্রমুখ কবিদের রচনায় রাষ্ট্রনীতি তথা দন্ডনীতির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাচীনকাল থেকে বিশালায়তন এই শাস্ত্রে কিভাবে রাষ্ট্রনীতিমূলক আলোচনার পরিপুষ্টি ঘটেছে, সেই বিষয়ে আলোকপাত করার জন্যই এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ রচনার প্রয়াস। এই প্রবন্ধে মূলত বেদ, রামায়ণ, মহাভারত, এবং স্মৃতিশাস্ত্রগুলিতে কিভাবে রাষ্ট্রনীতি তথা দন্ডনীতিমূলক চিন্তাধারার অগ্রগতি ঘটেছে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তবে মনে রাখতে হবে যে, তৎকালীন সমাজে রাজনীতি এবং দণ্ডনীতি সমার্থক।

প্রাচীন রাষ্ট্রনীতি বা দন্ডনীতির উৎপত্তি: অন্যান্য শাস্ত্রের ন্যায় সংস্কৃত রাষ্ট্রনীতির প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় বেদে। সংহিতায় এর আলোচনা স্বল্প হলেও ব্রাহ্মণভাগে এর বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে। বৈদিক সাহিত্য স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসেবে রাজনীতির আলোচনা কোথাও করেনি তথাপি প্রসঙ্গক্রমে রাজনৈতিক তথা রাষ্ট্রনীতিমূলক কথা বেদে লক্ষ্যণীয়। তবে মনে রাখতে হবে যে তৎকালীন রাষ্ট্রনীতি এবং বর্তমানে রাষ্ট্রনীতি এক নয়। সেযুগে রাজার উৎপত্তি এবং তার অনুসৃত নীতি, রাজ্যকে বশীভূত রাখার বিবিধ পন্থা ছিল রাষ্ট্রনীতির মূল মন্ত্র।

বৈদিকযুগের রাষ্ট্রনীতি: ঋগ্বেদসংহিতার ১০ম মণ্ডলে বলা হয়েছে— *"হে রাজা! আমাদের রাষ্ট্রের অধিপতি হবার জন্য তোমায় আহ্বান করেছি, তুমি আমাদের স্বামী হও এবং স্থির ও চলন রহিত হয়ে রাষ্ট্রের অধিপতি হও রাষ্ট্রের সকল প্রজা তোমাকে রাজা করুক, তোমার থেকে রাষ্ট্র যেন ভ্রষ্ট না হয়।"*

আ ত্বাহার্য - মন্তরেধি ধ্রুবস্তিষ্ঠাবিচাচলিঃ।
বিশ্বস্ত্বা সর্বাবাঞ্ছন্তু মাত্বদ্রাষ্টমধিভ্রশৎ॥[1]

একথা স্পষ্ট যে সমস্ত প্রজা একজনকেই রাষ্ট্রের অধিপতিরূপে কামনা করবে। কামনার হেতু রাজার প্রতি প্রজারা অনুরক্ত। রাজার অবলম্বন করা যে সব নীতিগুলি প্রজাদের রাজানুরক্তির কারণ সেই সব নীতির প্রণয়ন ও বিশ্লেষণই দন্ডনীতির প্রতিপাদ্য বিষয়। রাজা রাষ্ট্র প্রভৃতির স্পষ্ট ধারণা ঋগ্বেদে ছিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর রাজারা একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধও করতেন – এর প্রমাণও বেদে লক্ষ্যণীয়। বৈদিক সাহিত্যে নির্বাচিত রাজাদের মত বংশানুক্রমিক রাজাদের কথাও বর্ণিত রয়েছে ঐতরেয়, তৈত্তিরীয় এবং শতপথ ব্রাহ্মণে। মহান বংশ থেকে রাজা নির্বাচিত হতেন। বৈদিক সাহিত্যে নির্বাচিত রাজপদের কথা পাওয়া যায়। 'দশপুরুষম্ রাজন্যম্' শব্দটি শতপথব্রাহ্মণ এবং ঐতরেয়ব্রাহ্মণে পাওয়া যায়। এর অর্থ যারা দশপুরুষ ব্যাপী রাজত্ব করেছেন। রাজা যদি স্বৈরতন্ত্রী হয়ে পড়তেন তাহলে প্রজারা তাকে ক্ষমতাচ্যুতও করতে পারতো। এমনকি সেক্ষেত্রে ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের উপযুক্ত ব্যক্তি না পাওয়া গেলে গুণবান বৈশ্যকেও সিংহাসনে বসানো হত (তাণ্ড্য ব্রাহ্মণ ৬/৬/৫)। শতপথ এবং ঐতরেয়ব্রাহ্মণে নির্বাসনদন্ডপ্রাপ্ত রাজাদের নাম পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে মনুসংহিতার সপ্তম অধ্যায়ে, অর্থশাস্ত্রে, মহাভারতে এমন দন্ডপ্রাপ্ত রাজাদের তালিকা আছে। স্বেচ্ছাচারী, অবিনয়ী কয়েকজন রাজার কথা মনুসংহিতার সপ্তম অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে—

বেণো নষ্টোঽবিনয়ান্নহুষশ্চৈব পার্থিবঃ।
সুদা পৈজবনশ্চৈব সুমুখো নিমিরেব চ।[2]

বিভিন্ন জনগোষ্ঠী ও তাদের রাজাদের উল্লেখ ঋগ্বেদের মন্ত্রে পাওয়া যায়। যেমন ঐতরেয়ব্রাহ্মণে[3] বিভিন্ন অঞ্চলের রাজাদের উপাধির কথা জানা যায়। যথা— পূর্বাঞ্চলে রাজারা সম্রাট, দক্ষিণাঞ্চলে ভোজ, উত্তরাঞ্চলে বিরাট, মধ্যাঞ্চলে রাজা, পশ্চিমে ও দক্ষিণে স্বরাট্ নামে অভিহিত হতেন।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণের একটি অংশে বলা হয়েছে দেবদানবের পরস্পর যুদ্ধে দেবতা যখন পরাজিত হন তখন তারা চিন্তা করে বুঝলেন— এই পরাজয় ঘটেছে রাজা না থাকার জন্য। তাই তারা রাজা নির্বাচন করলেন। প্রাথমিক অবস্থায় রাজপদ নিয়ে যে সামাজিক চুক্তি হয়েছিল তা

রাজ্যাভিষেকের অনুষ্ঠান পদ্ধতি থেকে অনুমিত হয়। *"রাজা পশুরাজ বাঘের চামড়ার উপরে পা দিয়ে দাঁড়াতেন, তার পায়ের তলায় অমরত্বের প্রতীক হিসেবে একটা স্বর্ণখন্ড দেওয়া হত এবং মাথার উপরে একটা স্বর্ণখন্ড দেওয়া হত। এভাবে উভয় দিক থেকেই তাঁকে অমর করে তোলা হত।"*[4]

রাজপদ নির্বাচনসাপেক্ষ এবং বংশানুক্রমিক –এই উভয়মতই বেদে লভ্য। অথর্ববেদে যেমন রাজার নির্বাচনের কথা আছে[5]। তারও পরবর্তী ধর্মশাস্ত্রের যুগে রাজপদকে দেবদৃষ্ট বলে ঘোষণা করে তাকে বংশানুক্রমিক রূপে প্রদর্শন করা হয়েছে। যদিও প্রথমেই ঋগ্বেদে রাজাকে প্রজাপতির দ্বারা সৃষ্ট বলে সেখানেই বংশানুক্রমিক রাজপদের আভাস দেওয়া হয়েছে। সেই সময় রাজারা নিজেদের ক্ষমতার পরিচয় সূচক পদবী ব্যবহার করতেন এবং রাজসূয়, অশ্বমেধ, বাজপেয় প্রমুখ যজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বারা নিজেদের সার্বভৌম করে তুলেছিলেন। ব্রাহ্মণের পরে রাজার ক্ষমতা হলেও রাজারা ক্রমে সেই ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সচেষ্ট হন। রাজার বিশেষ ক্ষমতা থাকলেও বৈদিক যুগে সভা ও সমিতি নামক দুটি জনগণের প্রতিষ্ঠান রাজাকে চালনা করতেন। রাজার ক্ষমতা ও আচরণের প্রতি এই দুটি প্রতিষ্ঠানই তীক্ষ্ণ নজর রাখত। সংসদের মত এখানে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হত। তাণ্ডব্রাহ্মণে বলা হয়েছে এই সভার সভ্য হতে পারতেন কেবলমাত্র প্রাপ্তবয়স্ক এবং বিশিষ্টরাই। অথর্ববেদে[6] - প্রজাপতির যমজ কন্যা হিসেবে সভা ও সমিতির বর্ণনা করা হয়েছে। বেদে সভ্য, সভাপতি, সভাপাল প্রভৃতি শব্দ বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

রামায়ণ ও মহাভারতের যুগে রাষ্ট্রনীতি: বৈদিক যুগের পরে রামায়ণ ও মহাভারতের যুগে রাষ্ট্রনীতি তথা দণ্ডনীতিচিন্তা আরো বিস্তৃতি লাভ করে। রামায়ণে রাজ্য পরিচালনার জন্য আঠারো প্রকার কর্মচারী পদ সৃষ্টি হয়েছিল - মন্ত্রী, পুরোহিত, যুবরাজ, সেনাপতি, দৌবারিক, আন্ত: পুরাধিকৃত, ধনাধ্যক্ষ, নগরাধ্যক্ষ, প্রাড্ বিবাক, কর্মানিতক, দুর্গপাল, রাষ্ট্রপাল, দণ্ডপাল, ধর্মাধ্যক্ষ, বেতনদানাধ্যক্ষ, রাজ্যসীমাপালক, কার্যনিয়োজক, কারাগারাধ্যক্ষ। রামচন্দ্রের চিত্রকূটে অবস্থানকালে ভরত যখন তাকে ফিরিয়ে আনতে যান, তখন রামচন্দ্র তাকে যে উপদেশ দেন তা রাষ্ট্রনীতিমূলক তাৎপর্যে পরিপূর্ণ। এখানে চৌদ্দ প্রকার রাজদোষের কথা আছে। যথা— নাস্তিক্য, মিথ্যাব্যবহার, ক্রোধ, প্রমাদ, দীর্ঘসূত্রতা, বিজ্ঞজনের অদর্শন, আলস্য, ইন্দ্রিয় পরায়ণতা, একাকী মণ্ত্রণা, অর্থশাস্ত্রে অনভিজ্ঞজনের সঙ্গে মণ্ত্রণা, নিশ্চিত কার্যে বিরোধ, কামজ ও ক্রোধজ ব্যসন —এগুলি দূষণীয়। মনু[7] এদেরকে দোষ বা কুঅভ্যাস বলেছেন। দশরথের রাজ্যপরিচালনা ব্যাপারে বা তার মৃত্যুর পর উদ্ভূত অবস্থায় রাষ্ট্রনায়কদের কর্তব্যাকর্তব্যমূলক চিন্তার বিষয়টি সুন্দরভাবে রামায়ণে বর্ণিত হয়েছে যা এই বিষয়ে ইঙ্গিত করে যে সেসময় রাজারা নীতিবিদ্যায় অভিজ্ঞ ছিলেন। রামায়ণে রাবণ - শূর্পনখা সংবাদে, বিভীষণের রামসমীপে গমনকালে, রাবণ - কুম্ভকর্ণ সংবাদে তৎকালীন রাজধর্মের নানা পরিচয় মেলে।

মহাভারতের ভান্ডারে সবকিছুই রক্ষিত। এখানে অন্যান্য সমস্ত ধর্মের মধ্যে রাজধর্মকে বা দণ্ডনীতিকে শ্রেষ্ঠধর্ম বলা হয়েছে। রাজধর্মানুশাসনের ৫৬ অধ্যায়ে যুধিষ্ঠির বলেছেন— সমস্তজীবলোক রাজধর্মেই আশ্রিত। ধর্মার্থকামমোক্ষ —এই চতুর্বর্গ রাজধর্মেই সমাহিত। অশ্বের লাগাম, হস্তীর অঙ্কুশের মত রাজধর্ম সমস্ত ব্যক্তিকে সৎপথে পরিচালনা করে। রাষ্ট্রনীতিমূলক তত্ত্ব পরিপুষ্টি লাভ করেছে মহাভারতের সভাপর্বে যুধিষ্ঠিরের প্রতি নারদের রাজধর্মের উপদেশ, আশ্রমবাসিক পর্বের পঞ্চম অধ্যায়ে ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের রাজনৈতিক আলোচনায়, শান্তিপর্বে ৮৩ তম অধ্যায়ে, উদ্যোগ পর্বের ১২৯ অধ্যায়ে গান্ধারীর অনুশাসনে, উদ্যোগ পর্বের ১৩০ - ১৩৬ অধ্যায়ে বিদুরের অনুশাসনে এবং অন্যত্র অনেক স্থলেই রাষ্ট্রনীতির বিশেষ দিকগুলি বিস্তৃতি লাভ করেছে। মহাভারতের যুগের পূর্বেই দন্ডনীতি বিষয়ক চর্চা ব্যাপকভাবে বিস্তৃতি লাভ করেছিল এবং সে বিষয়ে যে অনেক গ্রন্থাদিও রচিত হয়েছিল তার কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। মহাভারতের রাজধর্মপর্বের ৫৯ তম অধ্যায়ে 'পৈতামহ তন্ত্র' নামক ভারতীয় দণ্ডনীতির উপর রচিত প্রাচীন গ্রন্থটির উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রজাপতি ব্রহ্মা দেবতাদের প্রার্থনা অনুসারে জনগণের হিতার্থে এক

লক্ষ অধ্যায় বিশিষ্ট এই মহাগ্রন্থ রচনা করেন। রাষ্ট্রকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় প্রায় সমস্ত বিষয় এই গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে। সমাজের অর্থলিপ্সু ও বিপথগামী জনগণদের মার্গদর্শন করিয়ে বিদ্যা, ধর্ম প্রভৃতি রক্ষার জন্য এই গ্রন্থ রচিত হয়। পৈতামহ তন্ত্রের সারসংকলন করে দশ হাজার অধ্যায়ে 'বিশালাক্ষ তন্ত্র' রচনা করেন বিশালাক্ষ। বিশালায়তন পৈতামহ তন্ত্র সাধারণ মানুষের অনধিগম্য ছিল। বিশালাক্ষ হলেন শিব। নীতিশাস্ত্রে শিবকেই বিশালাক্ষ বলা হয়েছে। কৌটিল্য প্রণীত অর্থশাস্ত্রে এই গ্রন্থের উল্লেখ আছে। ইন্দ্র আবার এই গ্রন্থের সারসংকলন রূপে ৫০০০ অধ্যায়ে 'বাহুদণ্ডক তন্ত্র' গ্রন্থ রচনা করেন। বাহুদণ্ডক তন্ত্রের সারসংক্ষেপ হল ৩০০০ অধ্যায়ে রচিত 'বার্হস্পত্য তন্ত্র'। কৌটিল্য এই গ্রন্থ থেকে অর্থশাস্ত্রে অনেক উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এই গ্রন্থটি বর্তমানে লুপ্ত। অদ্বৈত দার্শনিক শঙ্করাচার্যের শিষ্য বিশ্বরূপাচার্য (সুরেশ্বরাচার্য) যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার আচার অধ্যায়ের উপর বালক্রীড়া নামক যে টীকা রচনা করেছিলেন সেখানে সেনাপতি, প্রতিহার, গজাধ্যক্ষ, মন্ত্রী, দূত প্রভৃতির লক্ষণ হিসেবে বার্হস্পত্য তন্ত্র থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন[৪]। মহাভারতের শান্তিপর্বে (১৪, ১৫, ২৪, ৩৮), অনুশাসন পর্বে (২৩, ৩০, ৫৮) এই বার্হস্পত্য নীতির উল্লেখ আছে। ভাসের প্রতিমা নাটক এবং অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিতেও এর উল্লেখ পাওয়া যায়। বৃহস্পতিপুত্র ভরদ্বাজ নীতিশাস্ত্র প্রণয়ন করেন। মহাভারতের রাজধর্ম পর্বে (৫৮/৩) ভরদ্বাজকে নীতিশাস্ত্রের প্রবক্তা বলা হয়েছে। মনুসংহিতায় (৭/১৯), যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় আচারঅধ্যায়ে (৩১৭) ও কামন্দকীয় নীতিসারে ১/১৮ শ্লোকগুলির সাথে ভরদ্বাজের নীতিশাস্ত্রের মিল রয়েছে।

বার্হস্পত্য তন্ত্রের সারসংগ্রহ করে উশনা বা শুক্রাচার্য ১০০০ অধ্যায়ে রচনা করেন 'ঔশনস্ তন্ত্র'। এই গ্রন্থের অনেক সিদ্ধান্ত কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে গ্রহণ করেছেন।

প্রাচীন ভারতে রাজপুত্ররা বেদোপনিষদের সঙ্গে সঙ্গে দন্ডনীতির পাঠ নিতেন পন্ডিতদের থেকে। মহাভারতের শান্তিপর্বের ৩৭ অধ্যায়ে ভীষ্ম রাজনীতির পাঠ নিতেন বৃহস্পতি ও উশনার থেকে। বনপর্বে (৩২) দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরকে বলছেন দ্রুপদরাজ তার পুত্রদের বৃহস্পতিকথিত রাজনীতি শিক্ষা অধ্যয়নের জন্য এক ব্রাহ্মণের কাছে পাঠাতেন। আরও পরবর্তীকালে গল্পসাহিত্য পাঠে পঞ্চতন্ত্রে দেখা যায় দাক্ষিনাত্যের রাজা অমরশক্তি তার পুত্রদের নীতিশাস্ত্রশিক্ষার্থে পন্ডিত বিষ্ণুশর্মার কাছে পাঠান। শিক্ষাগুরুরা প্রায় সবাই ব্রাহ্মণ ছিলেন।

স্মৃতিশাস্ত্রে রাষ্ট্রনীতি: সংস্কৃত স্মৃতিশাস্ত্রগুলির মধ্যে রাষ্ট্রনীতি বিষয়ক সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হল কৌটিল্যপ্রণীত অর্থশাস্ত্র। কৌটিল্য প্রণীত এই গ্রন্থটি ১৫০ অধ্যায়ে, ১৫টি অধিকরণে বিভক্ত। গ্রন্থটিকে ম্যাকিয়াভেলীর The Prince —এর সাথে তুলনা করা হয়েছে। রাজার শাসনকার্যে সুবিধার জন্য এই গ্রন্থে লেখা হল বলা হয়েছে—

সর্বশাস্ত্রাণ্যনুক্রম্য প্রয়োগমুপলভ্য চ।
কৌটিল্যেন নরেন্দ্রার্থে শাসনস্যাবাবঃ কৃতঃ॥[৯]

প্রাচীন ভারতে প্রচলিত রাজতন্ত্রমূলক শাসন ব্যবস্থা এর বর্ণনীয় বিষয়। অর্থশাস্ত্র কিন্তু অর্থনীতি বিষয়ক শাস্ত্র নয়। বস্তুত এটি দণ্ডনীতিমূলক শাস্ত্র। কেন দণ্ডনীতিকে অর্থশাস্ত্র বলা হয়? এই প্রশ্নের উত্তরে স্বয়ং কৌটিল্য বলেছেন—

মনুষ্যাণাং বৃত্তিরর্থঃ মনুষ্যবতী ভূমিরিত্যর্থঃ।
তস্যাং পৃথিব্যাং লাভপালনোপায় শাস্ত্রমর্থশাস্ত্রমিতি॥[10]

মনুষ্যবতী ভূমির উপর অধিকারস্থাপন এবং তার যথাযথ সংরক্ষণ বিষয়ক আলোচনামূলক গ্রন্থ হল অর্থশাস্ত্র। চতুর্বর্গ (ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ) লাভই ভারতীয় জীবনের মূল লক্ষ্য। কৌটিল্য কিন্তু অর্থকেই বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। কৌটিল্যের রাষ্ট্রনীতি বর্ণাশ্রম ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। স্বধর্মের উল্লঙ্ঘন ঘটলে সমাজে যাতে বর্ণসাঙ্কর্য বা কর্মসাঙ্কর্য না ঘটতে পারে সে জন্য রাজাকে সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হত। কৌটিল্য মনে করেন কোনো প্রজা যেন স্বধর্ম থেকে বিচ্যুত না হয়। *তস্যাতিক্রমে লোকঃ সঙ্করাদুচ্ছিদ্যেত* কৌটিল্যের মতে আদর্শ রাজা তিনিই যিনি কামক্রোধাদি ও রিষড়্বর্গ ত্যাগ

করে জিতেন্দ্রিয় হবেন। প্রজাদের বিদ্যার উপদেশ দেবেন, প্রজাদের যোগক্ষেমের বিধান করবেন, গূঢ়পুরুষ নিয়োগের দ্বারা সমস্ত সংবাদ আপন দৃষ্টিগোচরে রাখবেন। এবিষয়ে কৌটিল্যের মত হল—

প্রজাসুখে সুখং রাজ্ঞঃ প্রজানাং তু হিতে হিতম্।
নাত্মপ্রিয়ং হিতং রাজ্ঞঃ প্রজানাং তু প্রিয়ং হিতম্॥[11]

কৌটিল্যের রাষ্ট্রনীতি সচিবায়ত্ত রাজতন্ত্র বিষয়ক। কারণ রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত থাকলেও রাজ্যশাসনের মুখ্য ভার ছিল মন্ত্রীদের ওপর। এছাড়াও বিভিন্ন পদে নিযুক্ত ছিলেন অধ্যক্ষ, নাগরিক, গ্রামাধ্যক্ষ, সর্বাধ্যক্ষ প্রমুখ। কৌটিল্যের রাজনীতিতে স্বেচ্ছাচারিতার কোনো অবকাশ ছিল না। দেওয়ানী এবং ফৌজদারী মামলার সর্বাধ্যক্ষ হিসেবে রাজাই গণ্য হতেন। বিচারের ক্ষেত্রে অপরাধীকে শাস্তিস্বরূপ দণ্ড দেওয়ার রীতি ছিল। রাজপদ দেবদৃষ্ট হলেও কৌটিল্য গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই বিশ্বাসী ছিলেন। রাজার পররাষ্ট্রনীতিও অর্থশাস্ত্রে আলোচিত হয়েছে। রাজার একটি বড় কর্তব্য প্রতিবেশী এবং বিদেশী রাজদের কাজকর্মের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা এবং প্রয়োজনে যুদ্ধ করা।

কৌটিল্যকে অনুসরণ করে বলা যায় যে, প্রাচীন ভারতীয় শাসনব্যবস্থা আধুনিক আমলা তন্ত্রের ন্যায় বিভিন্ন স্তরে বিন্যস্ত ছিল। আধুনিক রাষ্ট্রের মতোই তৎকালে বিভিন্ন দপ্তর ছিল। রাজকর্মচারীগণ যাতে রাজার অর্থ আত্মসাৎ করতে না পারে তার জন্য দপ্তরে রাজকর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হত। যথাযথ দণ্ডপ্রয়োগের মাধ্যমে অপরাধীদের শাস্তি দিয়ে রাজাকে কণ্টকশোধনের উপদেশ দিয়েছেন কৌটিল্য। দণ্ডনীতির অপপ্রয়োগ হলে সমাজে মাৎস্যন্যায়ের প্রাদুর্ভাব ঘটে। এই একই ভাবনার প্রতীতি রয়েছে মনুসংহিতায়। রাজনীতিতে মণ্ত্রণা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। তা যাতে প্রকাশিত না হয় সেজন্য যত্নবান হতে নির্দেশ দেন কৌটিল্য। বন্ধ গৃহে রাজা মণ্ত্রণা করবেন যেখানে কাক পক্ষীও প্রবেশ করতে পারবে না।

নাস্য গুহ্যং পরে বিদুঃ ছিদ্রং বিদ্যাৎ পরস্য চ।
গূহেৎ কূর্ম ইবাঙ্গানি মৎস্যাদ্বিবৃতমাত্মনঃ॥
যথা হ্যশ্রোত্রিয়ঃ শ্রাদ্ধং ন সতাং ভোক্তুমর্হতি।
এবমশ্রুতশাস্ত্রার্থো ন মাণ্ত্রং শ্রোতুমর্হতি॥[12]

রাজার গোপনীয় বিষয় শত্রুরা জানবেনা, কিন্তু শত্রুর ছিদ্র রাজাকে জানতে হবে। কচ্ছপের মত রাজা নিজের (আশু) করনীয় ব্যাপার গুলিকে গোপন রাখবেন। যেমন বেদজ্ঞানহীন ব্যক্তি সজ্জনের শ্রাদ্ধ ভোগ করার যোগ্য নয়, ঠিক তেমনভাবে রাজনীতি শাস্ত্রের অর্থ কখনও শোনেননি এমন ব্যক্তি মন্ত্রণার বিষয়ে শোনার যোগ্য নয়। অতএব মন্ত্রণা করবেন যে সব মন্ত্রীরা তারা অভিজ্ঞ হবেন, এক্ষেত্রে শাস্ত্রজ্ঞানহীন ব্যক্তিদের কোনো স্থান নেই।

শুক্রাচার্য রাষ্ট্রনীতি চিন্তাকে সুসংহত রূপে শুক্রনীতিসার গ্রন্থ রচনা করেন। সেখানে প্রথমেই বলা হয়েছে লোকস্থিতির জন্য রাজার নীতিশাস্ত্রজ্ঞান থাকা চাই।

সর্বোপজীবিকং লোকস্থিতিকৃন্নীতিশাস্ত্রকম্।
ধর্মার্থকামমূলকং হি স্মৃতং মোক্ষপ্রদঃ ততঃ।[13]

এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় ইন্দ্রিয়জয়, যুবরাজের লক্ষণ, রাষ্ট্রের লক্ষণ, রাজার কর্তব্য, সহায় রাজার সমৃদ্ধি ও অসহায় রাজার বিপত্তি, প্রজাদের বশীভূত করার উপায়, উপায়চতুষ্টয়, ষাড়গুণ্য প্রভৃতি রাষ্ট্রনীতিমূলক বিষয়ের আলোচনা রয়েছে। এই গ্রন্থে গুণের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করা হয়েছে। সমাজ বর্ণাশ্রমধর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হলেও গুণকে কোনোভাবে অমর্যাদা করা হয়নি।

খ্রীষ্টিয় সপ্তম শতাব্দীর কাছাকাছি ১৯ সর্গে আচার্য কামন্দকি কামন্দকীয় নীতিসার নামক গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে গ্রন্থকার কৌটিল্যকে গুরু মেনে পররাষ্ট্র বিষয়ক নীতিগুলিকে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন। কোন কোন শত্রুর সঙ্গে কিরূপ অস্ত্র দ্বারা যুদ্ধ করা উচিৎ নয়, রাজকর্মচারীর জীবিকা, দূত, মণ্ত্রণা, ব্যসন, রাজমণ্ডল, সন্ধি, ইন্দ্রিয়জয় প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

কামন্দকি রাজাকে জ্ঞানীদের থেকে শাস্ত্রজ্ঞান আহরণ করতে বলেছেন। কারণ রাজা অসংজিতেন্দ্রিয় হলে প্রজাদের অবস্থা কান্ডারী বিহীন নৌকার মত হয়—

যদি ন স্যান্নরপতিঃ সম্যঙ্ নেতা ততঃ প্রজাঃ।
অকর্ণধার জলধৌ বিপ্লবেতেহ নৌরিব॥[14]

কামন্দকি এই গ্রন্থে চাতুর্বণ্যের জীবিকা–সংস্থানের উপায়, অমাত্য, কোষ, রাষ্ট্র, দুর্গ, সপ্তাঙ্গ, দূত, মন্ত্রণা, ব্যসন, রাজকর্মচারীদের বিপথগামিতা ইত্যাদির আলোচনা আছে।

এছাড়াও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হল—

মন্ত্রী চণ্ডেশ্বর মিথিলার রাজা হরিসিংহের আদেশে 'রাজনীতিরত্নাকর' গ্রন্থ রচনা করেন। ১৬টি তরঙ্গে বিভক্ত এই গ্রন্থে রাজনীতি শাস্ত্র বিষয়ক সমস্ত আলোচনা পাওয়া যায়। ১৩৭০ খ্রীষ্টাব্দের পর ভবেশ মিথিলার সিংহাসনে বসেন। চণ্ডেশ্বর তার অমাত্য ছিলেন। রাজার উৎপত্তি, তাঁর অভিষেক, মন্ত্রণা, মন্ত্রী, ব্যসন, অমাত্য, স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি রাজনৈতিক বিষয়–আশয় এই রাজনীতিমূলক গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে।

- যশস্তিলকচম্পূর রচয়িতা জৈন পণ্ডিত সোমদেব ১০ম শতকের কাছাকাছি সময়ে 'নীতিবাক্যামৃত' নামে রাজনীতির গ্রন্থ রচনা করেন। জৈনধর্মের অনুশাসনের প্রভাব গ্রন্থে স্পষ্ট। রাষ্ট্রশাসন ও যুদ্ধের থেকেও রাজার আচরণের উপর শাস্ত্রকার অধিক প্রাধান্য দিয়েছেন।
- জৈন হেমচন্দ্র সূরী (১০৮৮ - ১১৭২) 'লঘু অর্হন্নীতি' নামক রাজনীতি শাস্ত্র রচনা করেন। শ্লোকাকারে রচিত এই গ্রন্থটিতে রাজনীতির অনেক বিষয় আলোচিত হয়েছে।
- ধারাধিপতি ভোজরাজ একাদশ শতকের প্রথম দিকে 'যুক্তিকল্পতরু' ও চাণক্যনীতি' নামক দুটি গ্রন্থ রচনা করেন। প্রথমটিতে সাধারণ রাজনীতি এবং দ্বিতীয়তে চাণক্যের রাজনীতির বিবিধ দিক আলোচিত হয়েছে।

উপসংহার: মনে রাখা প্রয়োজন যে প্রাচীন ভারতের রাজনীতি বা দণ্ডনীতি হল আধুনিক যুগের রাষ্ট্রনীতি বা রাষ্ট্রবিজ্ঞান। ভারতীয় রাষ্ট্রনীতির আলোচনা প্রসঙ্গে স্মৃতিশাস্ত্রগুলি বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। তবে স্মৃতিশাস্ত্রে গৃহ্য সূত্রের উপাদান আছে বলে রাষ্ট্রনীতি সংক্রান্ত বিষয়কে পৃথকভাবে আলোচনা করা হল। যেমন মনুসংহিতার সপ্তম অধ্যায়ের বিষয়বস্তু রাজধর্ম। যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার ব্যবহার অধ্যায় রাজনৈতিক আলোচনায় সমৃদ্ধ। এই আলোচনার ধারা বৈদিক এবং স্মৃতি শাস্ত্রের অধ্যায় পেরিয়ে লৌকিক সংস্কৃতসাহিত্যের আলোচনায় মহাকাব্যগুলিতে বিক্ষিপ্তভাবে প্রবহমান। মহাকবি কালিদাসের রঘুবংশ ও কুমারসম্ভব, মাঘের শিশুপালবধ, ভারবির কিরাতার্জুনীয়, কুমারদাসের জানকীহরণ, শ্রীহর্ষের নৈষধচরিত, ভট্টির ভট্টিকাব্য প্রমুখ মহাকাব্যগুলি বিক্ষিপ্ত ভাবে রাজনীতিমূলক উপদেশে সমৃদ্ধ।

Endnotes

1. *ঋগ্বেদ* – ১০/।
2. *মনুসংহিতা* – ৭/৪১।
3. *ঐতরেয়ব্রাহ্মণ* – ৮/১৫।
4. *শতপথব্রাহ্মণ* – ৫/৮/১/১৪।
5. *অথর্ববেদ* – ১/৯, ৩/৪, ৪/২২।
6. *অথর্ববেদ* – ৭/৩১/১।
7. *মনুসংহিতা* – ৭/৪৭।
8. *যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা*, আচার অধ্যায়, বালক্রীড়াটীকা – ৩০৭, ৩২৩।
9. *অর্থশাস্ত্র* – ১/১০/১৪।
10. *অর্থশাস্ত্র* – ১৫/১/১।
11. *অর্থশাস্ত্র* – ১/১৮/১।

12. *অর্থশাস্ত্র* – ১/১৫/৮।
13. *শুক্রনীতিসার* – ১/৫।
14. *কামন্দকীয় নীতিসার* – ১/১০।

Bibliography

- আচার্য, রাম নারায়ণ। *যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা* মুম্বাই: নির্ণয় সাগর প্রেস, ১৯৪৯ (প্রথম সংস্করণ)।
- *কৌটিলীয়ম্ অর্থশাস্ত্রম্* (প্রথম খণ্ড)। সম্পা. ও অনু. মানবেন্দু, বন্দ্যোপাধ্যায়। কলিকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০২ (প্রথম সংস্করণ)।
- গোপ, যুধিষ্ঠির। *বৈদিক সাহিত্যের ইতিহাস*কলিকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০০৯ (প্রথম সংস্করণ – পুনর্মুদ্রণ)।
- তর্করত্ন, শ্রীপঞ্চানন। *মনুসংহিতা* সম্পা. মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। কলিকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০০ (দ্বিতীয় সংস্করণ)।
- ন্যায়তীর্থ, বসু, সুমিতা। *যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা* (ব্যবহার অধ্যায়)। কলিকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০০ (প্রথম সংস্করণ)।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, উদয়চন্দ্র এবং বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিতা। *প্রাচীন ভারতের সংস্কৃত সাহিত্য* কলিকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০১২ (তৃতীয় সংস্করণ)।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রদ্যোতকুমার। *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস* কলিকাতা: দি ঢাকা স্টুডেন্টস লাইব্রেরী, ২০১০ (প্রথম সংস্করণ)।
- বসু, যোগীরাজ। *বেদের পরিচয়* কলিকাতা: ফার্মা কে. এল. এম. প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৩।
- ভট্টাচার্য, ডঃ ভবানীপ্রসাদ এবং অধিকারী, ডঃ তারকনাথ। *বৈদিক সঙ্কলন* (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)। কলিকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০০১।
- ভট্টাচার্য, সুকুমারী। *প্রাচীন ভারত সমাজ ও সাহিত্য* কলিকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড্, ১৩৯৪।
- মনু। *মনুসংহিতা* সম্পা. অশোককুমার বন্দোপাধ্যায়। কলিকাতা: সদেশ, ২০০৮ (সপ্তম সংস্করণ)।
- *মহাভারত* সম্পা. ও অনু. রাজশেখর বসু। কলিকাতা: এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৮৬ (নবম মুদ্রণ)।
- শাস্ত্রী, গৌরীনাথ। *A Concise History of Sanskrit Literature*। দিল্লী: এম. এল. বি. ডি., ১৯৯৮ (পঞ্চম সংস্করণ)।
- *Śrīmad Vālmīki Rāmāyana* (With Sanskrit Text and English Translation)। Part – I & Part – II। গোরক্ষপুর: গীতা প্রেস।